ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-V, May, 2026, Page No. 2127- 2136
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.05W.474

চণ্ডীমঙ্গল ও মনসামঙ্গল কাব্যের বন্দনা অংশের আলোকে বাংলার তীর্থসংস্কৃতি: একটি অনুসন্ধানমূলক সমীক্ষা

সুজয় মণ্ডল, *গবেষক, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর, অসম, ভারত*

Received: 25.05.2026; Accepted: 29.05.2026; Available online: 31.05.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

One of the major streams of medieval Bengali literature, the Mangalakavya, is not merely a genre devoted to the propagation of divine glory; it also serves as an important document of the social life, folk beliefs, religious consciousness, and regional culture of contemporary Bengal. In particular, the various pilgrimage centres mentioned in the invocation sections of Chandimangal and Monsamangal preserve valuable traces of the cultural geography, folk traditions, and pilgrimage culture of medieval Bengal. The present article attempts to explore the historical identity, folk beliefs, regional culture, and socio-religious significance of several fixed pilgrimage centres (sthābar tīrtha) mentioned in the invocation sections of Mukundaram Chakrabarti's Chandimangal and Ketakadas Kshemananda's Monsamangal. According to the Skandapurana, pilgrimage sites are broadly classified into three categories—sthābar, jangam, and mānasa tīrtha. Among these, the present study primarily focuses on sthābar tīrtha, or fixed sacred sites. Most of the pilgrimage centres mentioned in the invocation sections of the two texts are deeply associated with the rural and folk religious traditions of Bengal. Many of these local cults were gradually assimilated into the broader framework of Brahmanical Hinduism and eventually evolved into recognised regional pilgrimage centres. The article particularly discusses the legends, ritual practices, folk traditions, and collective social memory surrounding sacred sites and deities such as Uttarbahini of Shiyakhala, Rajballabhi of Rajbalhat, Kaluray of Hijli, Betaichandi of Betor, Melaichandi of Amta, Rankini of Moula, and Singhabahini of Baliya.

The discussion reveals that many of the deities mentioned in the Mangalakavya tradition were originally worshipped as local or folk deities. Over time, through the patronage of elite social groups, the financial support of merchant communities, and their gradual identification with Puranic deities, these folk gods and goddesses attained wider social acceptance. The legends associated with Rajballabhi of Rajbalhat, Melaichandi of Amta, and Rankini of Moula are significant examples of this process of social and religious transformation. At the same time, these pilgrimage centres—often located near ports, riversides, forests, and rural settlements—were closely connected with the economy, trade networks, and everyday life of medieval Bengal. The port of Betor, the Damodar riverbank

region of Amta, and the coastal area of Hijli may be cited as notable examples in this context.
Most of the pilgrimage centres discussed in the article are still located in different parts of present-day West Bengal and continue to function as active centres of worship and folk belief. Therefore, the descriptions found in the Mangalakavyas cannot be viewed merely as literary imagination; rather, they reflect a concrete historical and cultural reality. The references to pilgrimage sites and deities in the invocation sections of these texts illuminate the religious mentality, regional identity, and multidimensional folk culture of medieval Bengal.
In conclusion, it may be said that the invocation sections of Chandimangal and Monsamangal constitute an important literary source for understanding the pilgrimage culture of Bengal. Through these texts, a vivid picture of medieval Bengal's folk religion, regional deities, pilgrimage beliefs, and cultural geography emerges. Thus, the pilgrimage narratives of the Mangalakavya tradition are significant not only as literary or religious elements, but also as valuable sources for reconstructing the social and cultural history of Bengal.
Keywords: Mangalakavya, Pilgrimage Culture (Tirtha-Sanskriti), Folk Deities and Folk Beliefs, Medieval Bengal, Cultural Geography

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান ধারা মঙ্গলকাব্য কেবল দেবমাহাত্ম্য প্রচারধর্মী কাব্য নয়। মঙ্গলকাব্যগুলি সমকালীন বাংলার লোকবিশ্বাস সমাজজীবন, আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ধর্মচেতনারও এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এই সকল কাব্যে লৌকিক ও পৌরাণিক দেবদেবীর অলৌকিক মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি তাঁদের পূজার প্রসার এবং জনমানসে দেবশক্তির প্রভাব বিস্তারের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। মঙ্গলকাব্যের পাঠ বা শ্রবণের মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল সাধিত হয় বলেই এধরনের কাব্য 'মঙ্গলকাব্য' নামে পরিচিত। দেবমাহাত্ম্য প্রচারধর্মী এই কাব্যগুলিতে দেবচিহ্নিত স্থান, দেবীর অধিষ্ঠানক্ষেত্র, তীর্থস্থান এবং তৎসংলগ্ন লোকবিশ্বাসের বর্ণনাও স্বাভাবিকভাবেই বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। ফলে মঙ্গলকাব্যের তীর্থবর্ণনা কেবল ধর্মীয় ভাবনার পরিচায়ক নয়, বাংলার সাংস্কৃতিক ভূগোল ও লোকঐতিহ্যেরও গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন।

স্কন্দপুরাণ অনুযায়ী তীর্থকে প্রধানত তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে— স্থাবর তীর্থ, জঙ্গম তীর্থ এবং মানস তীর্থ। এর মধ্যে নির্দিষ্ট পবিত্র স্থানকেন্দ্রিক তীর্থকে স্থাবর তীর্থ বলা হয়। বর্তমান নিবন্ধে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের 'মনসামঙ্গল' এবং মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের বন্দনা অংশে উল্লিখিত বাংলার বিভিন্ন স্থাবর তীর্থের বাস্তব অবস্থান, লোকবিশ্বাস, ঐতিহাসিক গুরুত্ব এবং তৎকালীন সমাজ-সংস্কৃতির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক আলোচনার চেষ্টা করা হবে।

প্রায় প্রতিটি মঙ্গলকাব্যেই বিভিন্নভাবে তীর্থস্থানের উল্লেখ দেখা যায়। কখনও কবির বন্দনা অংশে, কখনও উপমা অলংকারের মাধ্যমে, কখনও দেবদেবীর বিচরণভূমি ও তাদের বক্তব্যে তীর্থপ্রসঙ্গ উঠে এসেছে। আবার কাব্যে মানব চরিত্রের তীর্থযাত্রা, কথোপকথন কিংবা কাব্যে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত নয় এমন দেবচরিত্রের আবাসস্থল ও বিচরণক্ষেত্রের উল্লেখের মধ্য দিয়েও তীর্থস্থানের পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে। 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের 'দিগবন্দনা' এবং 'মনসামঙ্গল' কাব্যের 'দেবদেবী বন্দনা' অংশে বিশেষভাবে অসংখ্য তীর্থক্ষেত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন—

'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে দিগবন্দনা - নীলাচলের জগন্নাথ, অযোধ্যা, গয়া, প্রয়াগ, দ্বারিকা, হিঙ্গুলাটের হিঙ্গুলাই, হস্তিনাপুর, হেমগিরি, বৈদ্যনাথ, বারাণসী, নারায়ণপুর, হিজলির কালুরায় দক্ষিণরায়, তমলুকের কৃষ্ণহরি, তপ্তবারাণসীর যোগেশ্বরী, সঙ্কেত মাধব, মাকালপটের মাহাকাল, পাটশিলার রঙ্গিণী, কালীপাটের মহাবলা,

বিক্রমপুর, শিয়াখালার দেউল, রাজবলহাটের চন্ডীর দেউল, কাইতির বাণেশ্বর, মউলার রঙ্গিণী, ভেউটিয়ার ভদ্রকালী, দামুন্যার বাসুলী, জাজপুরের বরাহ জয়া, জউগ্রামের বিষহরি, দামুন্যার চক্রবর্ত্ত, কঙর নগরের কামেশ্বর, চন্দ্রকোনায় গণপতি মহেশ্বর, বেতারগড়ের চণ্ডীকা বেতাই, খেপ্তের খেপাই, আমতার মেলাই, রাইপুরের শবাসিনী, খটপুরে হিড়িমাই অসুর-দলনী ইত্যাদি। বাংলা এবং বাংলার বাইরের স্থাবর তীর্থের সঙ্গে সঙ্গে বন্দনা করেছেন আদি কবি বাল্মিকী, পরাশর, ব্যাস, বৃহস্পতি, জয়দেব, কালীদাস, কৃত্তিবাস এবং চণ্ডীমঙ্গলের আদি কবি কানাহরি দত্ত। এগুলির মধ্যে নীলাচল, গয়া, প্রয়াগ, দ্বারিকা, হস্থিনাপুর, হেমগিরি, বৈদ্যনাথ, বারাণসী এরকম কয়েকটি তীর্থস্থল বাদ দিলে প্রায় প্রতিটি বাংলার তীর্থক্ষেত্র।

মনসামঙ্গল কাব্যে দেবদেবী বন্দনা- বৈদ্যনাথ, পুরি, অযোধ্যা, বৃন্দাবন, নদীয়া, নবদ্বীপ, হাসানহাটির জটি, নেহালি পাতায় নেত, সিজাচলে জগতী, রাজবলহাটের বাসুলি, মৌলায় রঙ্কিনী, বালিডাঙায় সর্বমঙ্গলা, দশঘরার বিশালাক্ষী, বারাসতে বিনোদিনী, কৃষ্ণনগরে গড়েশ্বরী, বালিয়ার সিংহবাহিনী, কালীঘাটের কালী, বেতড়ে বেতাই, পুরটে ঘাটু, আমতার মেলাই, সেয়াখোলার উত্তরবাহিনী, বন্দিপুরের বিনোদিনী, সিমিলার সুরেশ্বরী, জাজপুরের বিশালাক্ষী, সানিহাটের রক্তবিমলা, ক্ষীরগ্রামের যোগেশ্বরী, কাঙুরে কামিখ্যা, ইত্যাদি। এখানেও বৈদ্যনাথ, পুরী, অযোধ্যা, বৃন্দাবন বাদ দিলে প্রায় সমস্ত তীর্থক্ষেত্রগুলি বর্তমান বাংলার ভৌগোলিক সীমানায় অবস্থান করছে।

এবারে আমরা উভয় কাব্যে উল্লেখ আছে এমন তীর্থস্থান গুলি নিয়ে আলোচনা করব। প্রথমেই আসা যাক শিয়াখালার উত্তরবাহিনী দেবী মন্দির প্রসঙ্গে। হাওড়া জেলায় অবস্থিত শিয়াখালার উত্তরবাহিনী ইতিহাস প্রসিদ্ধ প্রাচীন তীর্থক্ষেত্র।কেতকাদাস 'মনসামঙ্গল' কাব্যে এই দেবীর বন্দনা করে বলেছেন- "সেয়াখালায় বন্দিলাম উত্তরবাহিনী।।"[১] মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে বলা হয়েছে-" শিয়াখালার দেউল আছে উত্তর দুয়ার।।"[২] কবিক কঙ্কনের উক্তি থেকে বোঝা যায় দেবীর মন্দিরটির অবস্থান শিয়াখালা গ্রামের উত্তর প্রান্তে অথবা তিনি উত্তরমুখী কোনো মন্দিরের প্রতিষ্ঠাত্রী। পশ্চিমবাংলার তীর্থ' গ্রন্থে প্রলয় সেন লিখেছেন- "একদা শিয়াখালার পাশ দিয়ে কৌশিকী নদী প্রবাহিত হত। গ্রামের ভেতর একটি বৃহৎ উত্তরমুখী দালানে দেবী উত্তরবাহিনী স্থাপিত।"[৩] সম্ভবত উত্তরমুখী দালানে অবস্থান বলেই এই দেবীর নাম হয়েছে উত্তরবাহিনী। বাংলার পাঠান সুলতান হুসেন শাহের উজির গোপীনাথ বসু উত্তরবাহিনীর আদি মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন। জনশ্রুতি অনুযায়ী জনৈক সাধক ব্রাহ্মণ কৌশিকী নদীগর্ভ থেকে দেবীর ছয় ইঞ্চি একটি কালো পাষাণ মূর্তি পেয়েছিলেন। কালক্রমে তা ক্ষয়প্রাপ্ত হলে পরবর্তীতে পাষাণমূর্তির অনুরূপ মাটির মূর্তি তৈরি করে উত্তরবাহিনীর পূজার্চনা হতো। আদি মূর্তিটি স্বর্ণ আভূষণে সজ্জিত করে পূজা করা হতো। তবে সে মূর্তিতে চুরি যাওয়ার পর মাটির মূর্তিটির অনুকরণে একটি বেলে পাথরের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৩৪০ বঙ্গাব্দের ১৬ই আষাঢ় শিয়াখালা নিবাসী ডাক্তার যামিনী কান্ত বলের প্রতিষ্ঠিত ছ ফুট লম্বা বেলে পাথরের মূর্তিটিই বর্তমানে পূজিত হয়। এখানকার দেবী মূর্তিটি দ্বিভূজা, ত্রিনয়না, ডান হাতে খড়্গ, আর বাঁ হাতে রুধির পাত্র। স্থানীয় সেবায়তগণ এই দেবীকে বিশালাক্ষীর অভিন্ন জ্ঞান করেন। প্রতি বৎসর আষাঢ় নতুন পাষাণ প্রতিমা প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে এখানে মহাসমারোহে উৎসব পালিত হয়।

রাজবলহাটের রাজবল্লভী দেবী: অধুনা হুগলি জেলায় অবস্থিত রাজবলহাট ছিল প্রাচীন ভুরশুট রাজ্যের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ বাণিজ্য নগরী। আর এখানকার জাগ্রত দেবীর নাম রাজবল্লভী। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ তার কাব্যে এই দেবীর বন্দনা করে বলেছেন-"রঙ্গে গীত শুন, মন দিবে মোর নাটে।/ প্রত্যক্ষ বাসলি বন্দো রাজবলহাটে।।"৪ রাজবলহাটের রাজবল্লভীই সবচেয়ে জাগ্রত দেবী। তবে কবি রাজবলহাটের দেবীকে বাসলী বলে উল্লেখ করেছেন। এই লৌকিক দেবী বাসলী বা বাসুলী বিশালাক্ষী নামেও পরিচিত। কবিকঙ্কন তার

কাব্যে রাজবলহাটের এই দেবীকে 'চণ্ডী' বলে উল্লেখ করেছেন। দুই কবি দ্বারা বন্দিত এই দেবী সম্ভবত একই। 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' গ্রন্থে ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন- "সমাজে পৌরাণিক দেবতাদিগের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর, পৌরাণিক পার্বতী ও বাসুলী অভিন্ন হইয়া আত্মপ্রকাশ করেন। তখন হইতেই বাসুলী দেবীর উপর পৌরাণিক গুণাবলী আরোপ করা হইতে থাকে এবং বাসুলীও তখন চণ্ডী নামে পরিচিত হন।"[৫] দেবী বাসলী সম্পর্কে প্রচলিত কয়েকটি ধারণা রয়েছে তা থেকে স্পষ্ট হয় কেতকাদাস রাজ বল্লভী দেবীকেই বাসলী দেবী বলেছেন। 'লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ' গ্রন্থে এই দেবীর স্বরূপ সম্পর্কে বলা হয়েছে-

> "বাসলীর মূর্তি অতি সুশ্রী-লক্ষ্মী, সরস্বতীর অনুরূপ; তবে এঁর পরিধানে রক্তাম্বর, গলে ও কটিদেশে নরমুণ্ড মালা; কোন কোন ক্ষেত্রে এঁর পদতলে বা পার্শ্বে শিব বা শিব-অনুরূপ মহাকাল, ভৈরব বা সিদ্ধপুরুষের বিভিন্ন বর্ণের মূর্তি দেখা যায়।"[৬]

রাজবলহাটের রাজবল্লভী দেবী মূর্তির মধ্যেও বাসলী দেবীর এই বৈশিষ্ট্য গুলি লক্ষ্য করা যায়। এখানে দেবী শ্বেত বর্ণা, ত্রিনয়নী, নরমুণ্ডের মালা সজ্জিতা, ডান হাতে তার ছুরি আর বা হাতে রুধির পাত্র। দেবীর ডান পা শব রুপি শিব বা মহাকালভৈরবের বক্ষে স্থাপিত। আর বাম পা বিরুপাক্ষের মাথায়। শুধু দেবীর স্বরূপই নয় রাজবলহাট স্থানটির প্রাচীন নাম ছিল রাজাপুর। পরবর্তীতে দেবীর নাম অনুসারেই স্থানটির নাম পরিবর্তিত হয় বলে অনেকে মনে করেন। আর যে দেবীর নাম অনুসারে একটি লোকপ্রসিদ্ধ তীর্থ নগরী গড়ে ওঠে কবি সেই স্থানের নাম নিয়ে অন্য কোন দেবী বন্দনা করবেন; এমনটা হবার সম্ভাবনা কম। আর কবিকঙ্কন উল্লেখিত রাজবলহাট এর চণ্ডী যে আসলে রাজবল্লবী দেবী তা তিনি কাব্যেই ইঙ্গিত দিয়েছেন। রাজবল্লবী দেবীর সম্পর্কে প্রচলিত সপ্ত ডিঙার কিংবদন্তীটি এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রাজবলহাটের পূর্ব নাম রাজাপুর। এখানে দেবী গরিব ব্রাহ্মণ কন্যার বেশে কোনো এক পরিবারে দাসীর কাজ করতেন। একদিন নদীপথে বানিজ্যে যাওয়া এক সদাগর তাঁকে জোর করে নৌকায় তুলতে গেলে দেবীর পা পড়ামাত্র তার ছয়টি নৌকা নদীতে ডুবে যায়। তখন বণিক বুঝতে পারেন তিনি সাধারণ মানবী নন। ক্ষমা চাইলে দেবী সন্তুষ্ট হয়ে ডুবে যাওয়া নৌকাগুলি উদ্ধার করেন। পরে সেই বণিক দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করে পূজার প্রচলন কিংবদন্তীর ধূসর ভূমি থেকে সরে এসে ইতিহাসের দিকে নজর দিলে দেখা যায় ষোড়শ শতকে রাজা রুদ্রনারায়ণ রায় নতুন করে মন্দিরটি নির্মাণ করেন। পরবর্তীতেও বেশ কয়েকবার মন্দিরটি সংস্কার হয়েছে। বর্তমান সময়েও রাজবল্লভী মন্দিরের দুর্গাপুজো সুবিখ্যাত। অষ্টমী পূজার আগে এখনো ক্ষুদ্রাকারে সাতটি ডিঙা পার্শ্ববর্তী পুকুরে ডোবানো হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রাজবল্লভপুরের সামগ্রিক চালচিত্র বদলে গেলেও রাজবল্লবী দেবীর পূজা উপলক্ষে প্রাচীন কিংবদন্তীটি এখনো রয়ে গেছে দেবীপূজার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে। মুকুন্দরামের 'চন্ডীমঙ্গল' কাব্যের 'দিগ-বন্দনা' অংশে প্রাচীন এই কিংবদন্তির প্রসঙ্গ এসেছে-

> "রাজবলহাট সেই গ্রাম নদীকূল।/ ডিঙ্গা লইয়া দিল সাধু চণ্ডীর দেউল।।/ কোথা চণ্ডী আছ গো তুমিত মশানে।/ দণ্ড চারি উর মাতা সেবক স্মরণে।।"[৭]

অর্থাৎ, নদী তীরে অবস্থিত রাজবলহাটে ডিঙার বিনিময়ে সাধু অর্থাৎ সদাগর চণ্ডীর দেউল প্রতিষ্ঠা করেন। রাজবল্লভী চণ্ডীরই রূপান্তর। 'পীঠনির্ণয়' গ্রন্থে রাজবলহাটকে শাক্তপীঠ এবং এখানকার অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে চণ্ডী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 'পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি' গ্রন্থে বিনয় ঘোষ লিখেছেন-

> "সদাগর যে দেবীর প্রতিষ্ঠা ও পূজা মেনে নিয়েছিলেন, তিনি বোধহয় 'চণ্ডী'। কিংবদন্তীতে সেই কাহিনিই এই রূপ পেয়েছে। পরে দেবী চণ্ডী যখন রাজার পূজ্য ও প্রিয় দেবী হন, অর্থাৎ ভুরশুটের রাজবংশের পোষকতা লাভ করেন, তখন 'রাজবল্লভী' হয় তাঁর নাম।"[৮]

রাজবল্লভী দেবীর সম্পর্কে প্রচলিত কিংবদন্তীটিও গ্রাম্য দেবীর অভিজাত সমাজে স্বীকৃতির পরিচয়কে বহন করে। 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের 'কালকেতু ফুল্লোরা' এবং 'ধনপতি খুল্লনা'-র কাহিনীও এই লৌকিক দেবীর অভিজাত সমাজে প্রতিষ্ঠার গল্প বলে। যাইহোক বর্তমানকালে রাজবল্লভী দেবীর পূজা বিশুদ্ধ শাস্ত্রীয় প্রথাতেই হয়। তবে অষ্টমী পূজার আগে ক্ষুদ্র ডিঙা পার্শ্ববর্তী পুকুরে ডুবানো রীতিটার মধ্যে অভিজাত সমাজে দেবীর প্রতিষ্ঠার কাহিনীটি আজও জীবিত রয়ে গেছে।

হিজুলীর কালু রায়: গ্রাম্য দেবদেবীর মধ্যে কালুরায় অন্যতম। ইনি মূলত দক্ষিণ বঙ্গের লৌকিক দেবতা। দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মেদিনীপুর জেলার দক্ষিনাংশে পল্লী ও বনাঞ্চলে নিম্ন বর্গীয় জনগোষ্ঠীর দ্বারা তিনি পূজিত হন। প্রচলিত কিংবদন্তি অনুযায়ী বড় ভাই কালু রায়ের কাছে মালিকানা সংক্রান্ত কোন্দলে হেরে গিয়ে উত্তররায় উত্তরে তরাই অঞ্চলে এবং দক্ষিণ রায় দক্ষিণের সুন্দরবনে পালিয়ে যান। উত্তররায় সম্পর্কে প্রচলিত কিংবদন্তিটি ছাড়া তেমন কোনো তথ্য মেলেনি। রায়মঙ্গল, কাব্যে দক্ষিণ রায়ের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। ইনি বাঘের দেবতা। আর দক্ষিণরায় মহিষের দেবতা। মেদিনীপুরের বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চল এই মহিষ দেবতা কালুরায়ের মহল্লা। একসময় এই অঞ্চলে প্রচুর বুনো মহিষ থাকত। এখানকার মহিষাদল, মহিষাগোঠ ইত্যাদি গ্রামনাম গুলি তারই সাক্ষ্য বহন করে। মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে এখনো ষাঁড়ের পূজা হয়।

তবে কালুরায়ের মানবীয় মূর্তিতে পূজিত হতেও দেখা যায়। সেখানে তার মাথায় পাগড়ী, কোথাও কোথাও বাবরী চুল, কানে কুন্ডল, কপাতে তিলক, বড়ো বড়ো চোখ, টিকালো নাক, কান পর্যন্ত বিস্তৃত গোঁফ, মুখে দাঁড়ি নেই। কালুর এই কালু রায়ের সাজ অনেকটা যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত কোনো পৌরাণিক দেবতার মত। পিঠে তীর ধনুক, হাতে টাঙ্গী ও ঢাল, কোমরবন্ধে নানারকম অস্ত্র।'চণ্ডীমঙ্গল' এবং 'মনসামঙ্গল' কাব্যের দেববন্দনা অমগশে এই দেবতা সম্পর্কে বলা হয়েছে

> "হিজলীর কালুরায় বন্দো একচিত।/ যার নাম স্মরণে পশুর নাহি ভীত।[৯] / "হিজলীর দেবতা বন্দিব কালুরায়।/ সদানন্দে বন্দিব ঠাকুর দক্ষিণরায়।।"[১০]

'মনসামঙ্গল' কাব্যে দক্ষিণরায়ের প্রসঙ্গ নেই। 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে কালুরায়ের সঙ্গে বন্দিত হয়েছেন দক্ষিণরায়। তবে তিনি কোন অঞ্চলে পূজিত হন সে প্রসঙ্গে একাব্য আমাদের কোনো তথ্য দেয় না। তবে দুই কবির সময়কালে কালুরায় এবং দক্ষিণরায় উভয়েই যে লোকপ্রসিদ্ধ দেবতা ছিল এবিষয়ে কোনো শংসয় থাকে না। মেদিনীপুর জেলার খড়পুর মহকুমার একটি এলাকা হলো হিজলী। এই অঞ্চলে কালুরায়ের পূজা অতি প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। আর এই অঞ্চলের কথাই কাব্যে উল্লেখ আছে। তবে এই অঞ্চলে তৎকালীন সময়ে কোনো মন্দির ছিল কি না, বা মানব মূর্তিতে তিনি পূজিত হতেন কি না একথা এখন নিশ্চিত করে বলা যায় না। প্রচলিত কিংবদন্তী অনুযায়ী কালুরায়ের মহল্লা বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চল। সে অঞ্চলে তিনি বহুল প্রচলিত ছিলেন। মানব মূর্তিতেই হোক বা প্রস্তর খণ্ডেই হোক তিনি ওই অঞ্চলের জাগ্রত দেবতা হিসেবে বিবেচিত হতেন বলেই মঙ্গলকাব্যের এই কবি দ্বয়ের দ্বারা বন্দিত হয়েছেন বলে মনে হয়। এই দেবতার পূজায় মহাকালের মন্ত্র পাঠ করা হয়, কেননা মহিষ যমের বাহন।

বেতড়ে বেতাই: হুগলি জেলার শিবপুরের দক্ষিণ দিকে শালিমারের কাছে আন্দুল রোড এবং জে. টি রোডের সংযোগস্থলে অবস্থিত বেতাইচণ্ডী অতীপ্রাচীন কাল থেকেই অত্যন্ত জাগ্রত একটি মন্দির। 'হাওড়া জেলার ইতিহাস' গ্রন্থে এই মন্দিরের এবং বেতড়গড়ের অতীত ইতিহাস সম্পর্কে বলা হয়েছে

> "শিবপুরের বেতাইচণ্ডীর মন্দির খুবই প্রাচীন। বেতড্ড বা বেতড় বন্দর তখন ছিল একটি প্রসিদ্ধ বন্দর। সরস্বতী নদী মজে গেলে সপ্তগ্রাম বন্দরে সরাসরি যাওয়াঅসুবিধাজনক ছিল।

> তাই বেতড় বন্দরে নঙ্গর করে নদীপথে বাণিজ্য চলতো। ধনপতি সওদাগর প্রভৃতি বণিকরা সমুদ্রপথে বাণিজ্য করার পথে বেভড্ড বা বেতাই বন্দরে বেত্তদেবী তথা বেতাই চণ্ডীকে পুজো দিয়ে তবেই তাঁরা আদি গঙ্গা দিয়ে বাণিজ্যে যাত্রা করতেন। এর বিবরণ মনসামঙ্গল কাব্যেও সুন্দরভাবে রয়েছে। সরস্বতী নদী শুকিয়ে গেলে এই বন্দরের গুরুত্ব কমে যায়। পর্যন্ত বেতাইতলা বাজারের পাশেই একটি নিরাভরণ ইটের মন্দিরে সি কোটরাগত চোখ ও লম্বা নাকযুক্ত দেবী মূর্তি ভক্তদের দ্বারা পুজা, আসছেন।"[১১]

মুকুন্দের 'চণ্ডীমঙ্গল' এবং কেতকাদাসের 'মনসামঙ্গল' কাব্যের বন্দনা অংশে এই বেতাইচণ্ডীর প্রসঙ্গ এসেছে এভাবে- "বেতারগড়েতে বন্দে চণ্ডীকা বেতাই"[১২] এবং "কালীঘাটে কালী বন্দো, বেতড়ে বেতাই।"[১৩] কাব্য দুটিতে উল্লেখ থেকেই বোঝা যায় কবি দ্বয়ের সমকালীন সময়ে বেতড়গড়ের দেবী বেতাইচণ্ডী বা চণ্ডীকা বেতাই জাগ্রত এবং বহু মানুষের ভক্তির আশ্রয়স্থল ছিলেন। অতীতে সরস্বতী এবং গঙ্গা নদীর মিলিত মোহনায় গড়ে ওঠা স্থানটি বেতবনে ঘেরা ছিল বলে এই স্থানটির নাম হয়েছিল বেত্রধারা। পরবর্তীতে 'বেত্রধারা' অপভ্রংশ হয়ে হয় 'বেতড়'। কথিত আছে প্রায় ৪৫০ বছর পূর্বে শ্যাওড়াফুলির জনৈক রাজা জঙ্গলের মধ্যে দেবীকে কুড়িয়ে পেয়ে দেবীকে প্রতিষ্ঠা করেন। এ প্রসঙ্গে অন্য মতটি হল শিবপুরের জমিদার রায়চৌধুরী পরিবারের পূর্বপুরুষেরাই নাকি প্রথম দেবীর মুখমণ্ডল বেতবনে কুড়িয়ে পান এবং প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমান মন্দিরটি ১৯০২ সালে নির্মাণ করা হয়। এখানকার দেবীমূর্তিটি পাথরের। দেবীমূর্তিটির মুখমণ্ডল ছাড়া বাকি অংশ কাপড়ে ঢাকা থাকে।

আমতার মেলাই: পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলার উলুবেরিয়া মহকুমার আমতা রেলস্টেশনের কাছে অবস্থিত মেলাইচণ্ডী মন্দিরটি এই অঞ্চলের প্রধান পুরাকীর্তি গুলির মধ্যে অন্যতম। বাংলার লৌকিক দেবদেবীর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় দেবী বোধহয় চণ্ডী। যদিও শাস্ত্রী এবং লৌকিক দু ধরনের চণ্ডী পূজার চলনই দেখা যায়। আদিম জনগোষ্ঠীর লোকবিশ্বাসে দেবী চণ্ডীর দেবী সত্তার প্রকাশ অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন নামও দেওয়া হয়েছে যেমন নেকড়াই চণ্ডী, বসন চণ্ডী, হেঁটাল চণ্ডী, ইত্যাদি।এ সকল লৌকিক চণ্ডী দেবীর নির্দিষ্ট কোনো অবয়ব নেই।

তবে আমাদের আলোচ্য হাওড়া জেলার মেইচণ্ডী দেবীর একটি মূর্তি রয়েছে। কেতকাদাসের 'মনসামঙ্গল' এবং মুকুন্দরামের 'চন্ডীমঙ্গল'-এ দেববন্দনায় বিভিন্ন তীর্থ স্থানের নাম, সেখানে পূজিত দেব দেবীর নাম এলেও মন্দিরের স্থাপত্যশৈলী মূর্তি কলা মন্দিরগাত্রে দেবীর ভাস্কর্য, মন্দির গাত্রের চিত্রকলা এ সকল বিষয়ে কবিরা খুব বেশি বর্ণনা করেননি।যাহোক যে দুটি কাব্যকে কেন্দ্রে রেখে আলোচনা সেই কাব্যে মেলাই চণ্ডী সম্পর্কে বন্দনা অংশে কেবল "আমতার মেলাই"[১৪] এটুকুই রয়েছে। হতে পারে কবিদ্বয়ের সময়ে বর্তমান মন্দিরটি ছিল না, মন্দিরের নির্মাণ কার্য তারপরে হয়েছে। মন্দিরের নির্মাণকাল সম্পর্কে বিনয় ঘোষ লিখেছেন-

> "এই ফলকে নাকি বাংলা ১০৫৬ সন লেখা ছিল, অর্থাৎ ইংরেজি ১৬৪৯ খ্রিষ্টাব্দ। কিন্তু আমাদের তা মনে হয় না। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে অথবা আঠার শতকের শেষ দিকে মন্দিরটি নির্মিত বলে মনে হয়।"[১৫]

তবে পাথরের পাপীঠের উপরে দেবীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত সেটি অনেক প্রাচীন এবং মূর্তির পাশে অবস্থান করা কষ্টি পাথরের বিষ্ণু-বাসুদেব ও কার্তিক মূর্তিকে বেশ প্রাচীন, অন্তত সেন আমলের বলে মনে করেন। আমতার অবস্থান দামোদরের তীরে। যে কারণে একসময় এখানে বন্দর গড়ে উঠেছিল। তখন থেকেই আমতা বাণিজ্য এবং মেলাই চণ্ডীর থান বা পরবর্তীতে গড়ে ওঠা মন্দিরকে কেন্দ্র করে গুরুত্বপূর্ণ একটি তীর্থস্থান। অনেক

এটিকে একান্নপীঠের একটি মনে করেন। কিংবদন্তী অনুসারে বিষ্ণুচক্রে খন্ডিত সতীর হাটুর মালাইচাকী দামোদরের অপর তীরে জয়ন্তী নামক গ্রামে পরে। আর এই মালাইচাকী থেকে আর এই মালাইচাকী থেকে দেবীর নাম মেলাইচণ্ডী। দেবী নাকি আগে এই জয়ন্তী গ্রামেই অবস্থান করতেন। জয়ন্তী থেকে জটাধারী নামক একতান্ত্রিক আমতায় এনে দেবীকে প্রতিষ্ঠা করেন। মেলাইচণ্ডী দেবী এবং তার প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত কিংবদন্তীটি অতি চমকপ্রদ-

কিংবদন্তি অনুযায়ী, এক ব্রাহ্মণ স্বপ্নাদেশে জয়ন্তীর বনে দেবীর মূর্তি খুঁজে পান এবং প্রতিদিন দামোদর নদ পার হয়ে পূজা করতেন। এক বর্ষার দিনে নদী উত্তাল থাকায় তিনি ভেসে আসা একটি কাঠের গুঁড়ির সাহায্যে নদী পার হন। পরে তিনি বুঝতে পারেন, সেটি আসলে একটি কুমির ছিল। এরপর তিনি দেবীমূর্তি এপারে এনে আমতায় প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখান থেকেই দেবীর পূজার প্রচলন শুরু করেন।

যাহোক আমতায় মেলাইচণ্ডীর বর্তমান মন্দিরটি কলকাতার হাটখোলার দত্ত পরিবারের আর্থিক সহায়তায় নির্মাণ করা হয়। কিংবদন্তী অনুযায়ী কলকাতার হাটখোলার দত্ত পরিবারের ব্যবসায়ী কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত নৌকায় লবণ বোঝাই করে দামোদর দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ নৌকা ডুবে যায় এবং দেবীর কৃপায় তিনি সেই নৌকাগুলো আবার ফিরে পান। দেবীর প্রতি কৃতজ্ঞতা বসত আমতায় মেলাই চণ্ডী দেবীর মন্দিরটি স্থাপন করেন। মন্দিরের প্রবেশ দ্বারে মন্দির নির্মাণের সময় লেখা আছে তা থেকে অনুমান করা হয় মন্দিরটি ১০৫৬ বঙ্গাব্দে নির্মাণ হয়েছিল।

বর্তমানে মেলাইচণ্ডী মন্দির দৈর্ঘ্যে ১৪, প্রস্থে ১৪ এবং উচ্চতায় ২৫ ফুট। প্রায় তিন ফুট উঁচু পাথরের বেদীর উপর দেবীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরটি পরবর্তীকালের হলেও দেবীমূর্তি (শুধুমাত্র মুখাবয়বই আছে), পাথরের বেদী, দেবীর পাশে অবস্থান করা অন্যান্য মূর্তি এগুলো অত্যন্ত প্রাচীন বলেই মনে হয়।বাংলায় অনেক বিখ্যাত চণ্ডী দেবী এভাবেই প্রতিষ্ঠিত আছেন। যারা কোনো মন্দিরে অবস্থান করেন না। সাধারণত নদী তীর বা কোনও বড় গাছের তলায় এদের থান থাকে। আমতার মেলাইচণ্ডী দেবীর আদি রূপটিও বোধহয় এমনই ছিল। পরবর্তীতে বণিক সমাজের অর্থ আনুকূল্যে দেবীর অলংকার এবং দেবগৃহ নির্মাণ হয়।

মৌলায় রঙ্কিনী দেবী: রঙ্কিণী দেবী হলেন পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খন্ড এবং ওড়িশার বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায় কর্তৃক পূজিত এক গ্রাম্য দেবী। রঙ্কিনী দেবীর আদি অধিষ্ঠানক্ষেত্র ধল ভূমের মহুলিয়ায় হলেও পরবর্তীতে কোন এক সময় ধলভূমের রাজধানী ঘাটশিলায় দেবীকে স্থানান্তরিত করা হয়। এখানে ভূস্বামী রাজ বংশের কুলদেবী। ছোটনাগপুরের অরণ্য নিবাসী মানুষের পরম আরাধ্য এবং প্রভাবশালী দেবী হলেন রঙ্কিনী। কালক্রমে দেবীর পূজা মেদিনীপুর, হুগলী ও বর্ধমান জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। ভক্তদের ধারণায় এই দেবী ভয়ংকরী, রক্তমুখী, রক্তবর্ণা, নর-রক্ত পিপাসু। এই দেবীর পূজায় নর রক্ত এবং পশু পাখির রক্তদান করলে দেবী তুষ্ট হন। ওড়িশার 'রঙ্ক' শব্দের অর্থ 'উন্মাদ' এবং সিংভূম জেলার 'বহড়াগড়' বলে একটি স্থানে এর অর্থ 'রাক্ষসী' বলে প্রচলিত আছে। ঘাটশিলারা এই দেবীর প্রসঙ্গ মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে এসেছে- 'রঙ্গিণী বন্দিব যার পুরী পাটশিলা"[১৬]

এখানে 'রঙ্গিণী' বলা হয়েছে রঙ্কিনী দেবীকে আর 'পাটশিলা' বলা হয়েছে ঘাটশিলাকে। যাইহোক রঙ্কিণী দেবীর আদি বাসস্থান ধলভূমে এবং পরবর্তীতে রাজধানী ঘাটশিলায় রাজপরিবারের পূজ্য এই দেবী যে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিলেন তা মুকুন্দরামের কাব্য থেকেই স্পষ্ট। ঘাটশিলার দেবী মূর্তি অষ্টভুজা হলেও সর্বত্র দেবী মূর্তি রূপে পূজিত হন না। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের 'মনসামঙ্গল' কাব্যের 'দেবদেবী- বন্দনায়' এই দেবীকে বন্দনা করে কবি লিখেছেন- "মৌলায় রঙ্কিনী বন্দো অতিনুপাম।।"[১৭] কবিকঙ্কনের 'চন্ডীমঙ্গল' কাব্যে আছে-

"মউলার রঙ্গিণী বন্দো মস্তকের পাগে।।"[১৮] বলরাম দাসের 'কালিকামঙ্গল' রূপরাম ও মানিকরামের দিগবন্দনায় 'মৌলায় রঙ্কিনী দেবীর' উল্লেখ আছে। তবে 'মৌলা' বলে অন্তত তিনটি স্থানে রঙ্কিনী দেবীর পূজা হয়। উল্লেখিত কবিরা কোন মৌলার অধিষ্ঠাত্রী রঙ্কিনী দেবী প্রসঙ্গ কাব্যে উল্লেখ করেছেন তা স্থির করে বলা যায় না। তবে বন্দনাঅংশের অধিকাংশ স্থান বিচার করে মনে হয় বর্ধমান জেলার রঙ্কিনী দেবীর প্রসঙ্গই তারা উল্লেখ করে থাকবেন। প্রসিদ্ধ রঙ্কিনী দেবীর অধিষ্ঠান ক্ষেত্রগুলি মৌলা বলে পরিচিত পাবার কারণ হলো এই দেবীর সঙ্গে মহুয়া বা মৌল গাছের সম্পর্ক। প্রচলিত একটি লোকছড়ায় এই দেবীর নাম প্রসঙ্গ উল্লেখ রয়েছে- মহুল বৃক্ষের তলে বিশ্রাম আমার।/ মহুলিয়া নামে গ্রাম হইবে প্রচার।।

যে অঞ্চলে দেবীর উপাসনা শুরু হয় সেই অঞ্চলে সম্ভবত মহুয়া গাছের আধিক্যের কারণে হোক অথবা দেবীর আদি থান কোনো মহুয়া গাছের তলায় ছিল বলেই পরবর্তীতে দেবী যে স্থানেই গেছেন সঙ্গে করে পূর্বস্মৃতি হিসেবে 'মহুল' বা 'মৌলা' নামটি সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন। গ্রামের আসল নামের পূর্বে দেবীর প্রথম উপাসনাকেন্দ্র যা মহুয়া গাছের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত 'মৌলা' শব্দটিও উচ্চারিত হয়, যেমন মৌলাপরমানন্দপুর। রঙ্কনী দেবীর আদি অধিষ্ঠান ধলভূমের মহুলিয়ায় একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এছাড়াও মৌলা নামে আরও দুটি জায়গার নাম পাওয়া যায় এবং যথারীতি সেখানেও রঙ্কিনী দেবীর উপাসনা হয়।

এবারে আসা যাক বর্ধমানের জামালপুর থানার অন্তর্গত গোপীকান্তপুর এর দক্ষিণে রঙ্কিনী মহুলা বা মৌলার রঙ্কিনী দেবী প্রসঙ্গে। বর্ধমান জেলায় এই দেবীর প্রতিষ্ঠা কত কাল পূর্বে হয়েছিল তা জানা যায় না। সম্ভবত এখানকার কোনো আদিবাসী জনগোষ্ঠী দামোদরের প্রবাহ পথে অরণ্য ঘেরা কোনো স্থানে দেবীকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। তবে ষোড়শ শতকের আগে রঙ্কিনী দেবীর পূজা যে এ অঞ্চলে বিশেষ প্রসিদ্ধি পেয়েছিল টা পূর্বে লিখিত সাহিত্যিক বিবরণ থেকে বোঝা যায়। রঙ্কিনী দহের পশ্চিম দিকে অরণ্য মাঝে একটি মন্দিরে দেবীর অধিষ্ঠান। দেবের মৃন্ময়ী মূর্তিটির উচ্চতা প্রায় ১২ ফুট। লোকশ্রুতি আছে রাম ব্রহ্মচারী নামে কোন একতান্ত্রিক সাধক কানা দামোদরের তীরে অরণ্য মধ্যে দেবীকে প্রতিষ্ঠা করেন, এবং তান্ত্রিকমতে তার পূজা করেন। প্রতিবছর ফাল্গুন থেকে বৈশাখ পর্যন্ত মঙ্গল ও শনিবার দেবীর বিশেষ পূজার ব্যবস্থা হয় এবং পয়লা বৈশাখে চরক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই সময় বিভিন্ন গ্রাম থেকে গ্রামের মানুষজন পূজার উপকরণ, বলির জন্য ছাগল প্রেরণ করেন। দেবীর উদ্দেশ্যে গ্রামের মানুষের এই পূজার উপকরণ প্রেরণ প্রথাটি সম্ভবত ঘাটশিলার অনুকরণে এখানে প্রচলন হয়েছে।

যাইহোক 'মনসামঙ্গলের' কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ সম্ভবত বর্ধমানের মৌলার এই রঙ্কিনী দেবীর কথাই বলে থাকবেন। দুই মঙ্গলকাব্যের বন্দনায় বাংলার অন্যান্য দেবদেবীর অবস্থান এবং কবিদের সময়কাল বিচার করে মনে হয় এই তীর্থ স্থানের প্রসঙ্গেই কবিরা বর্ণনা করেছেন। কেননা মেদিনীপুরের 'মৌলা পরমানন্দপুর' নামটির মধ্যে 'পরমানন্দপুর' শব্দটি রয়েছে। অন্যদিকে বর্ধমানের রঙ্কিনী দেবীর স্থান শুধু মৌলা বলেই পরিচিত।

বালিয়ার সিংহ বাহিনী: হাওড়া জেলার পুরাকীর্তি গুলোর মধ্যে অন্যতম জগৎবল্লভপুর ব্লকের নিজবলিয়া গ্রামের দেবী সিংহবাহিনীর মন্দির। প্রাচীনকাল থেকেই দেবী সিংহবাহিনী এই অঞ্চলে পূজিত হন। গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন সিংহবাহিনী। দেবীর আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠা নিয়ে লোকমুখে অনেক কথা কাহিনীর প্রচলন আছে।

আনুমানিক পঞ্চদশ শতাব্দীতে নিজবালিয়া গ্রামে মানিকরাম চক্রবর্তী নামক এক শাস্ত্রজ্ঞ পন্ডিত বসবাস করতেন। তিনি গৃহী মানুষ হলেও পাশে থাকা একটি প্রকাণ্ড নিম গাছ তলায় নিয়মিত যোগ সাধনা করতেন।

হঠাৎ একদিন সন্ধ্যা বেলায় যোগ সাধনার সময় রত্নালঙ্কারে ভূষিত এক কিশোরী ব্রাহ্মণ কন্যাকে দেখতে পেলেন। ব্রাহ্মণ কন্যাটির কাছে তার পরিচয় জানতে চাইলে সে জানায় সে নাকি বর্ধমান রাজার কন্যা এবং সে নায়েবের সঙ্গে জমিদারি দেখতে এসেছে। একথা বলার পর কন্যাটি নিম গাছ তলায় বসলেন। মানিকগ্রাম চক্রবর্তী তখন তার স্ত্রীকে ডেকে আনতে গেলেন, কিন্তু তারা ফিরে এসে দেখলেন সেই কন্যাটি আর নেই। অন্যদিকে ঠিক ঐদিন ওই সময়েই বর্ধমান রাজা স্বপ্নাদেশ পায়। জানা যায় দেবীর সিংহবাহিনী নাকি মহারাজার কন্যা বেশে নিজবালিয়া গ্রামে এসেছিলেন। স্বপ্নে দেবী মহারাজাকে আরো জানান যে মানিকরাম চক্রবর্তীর বসত বাড়ির পাশে যে নিম গাছটির তলায় তিনি বসেছিলেন সেই গাছের কাঠ দিয়েই যেন তার মূর্তি প্রস্তুত করা হয়। দেবীর স্বপ্নাদেশ অনুযায়ী মহারাজ নিজ বালিয়া গ্রামের মধ্যস্থলে বিশাল মন্দির স্থাপন করেন। মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হলে শুভ দিন দেখে মন্দিরে তা প্রতিষ্ঠা করেন এবং মন্দিরের প্রধান পুরোহিত হিসাবে মানিকরাম চক্রবর্তীকে নিযুক্ত করেন। চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে মুকুন্দরাম চক্রবর্তী লিখেছেন– "বালিয়াতে বন্দিলাঙ সিংহবাহিনী / অনাথ দেখিয়া কর্যাছে আপুনি।।"[১৯]

মুকুন্দের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের রচনাকালকে নথি হিসেবে ধরলে সিংহবাহিনী প্রায় ৫০০ বছরের প্রাচীন মন্দির। আটচালা পাথরের মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকাল খোদাই করা আছে ১১৯৭ অগ্রহায়ণ। অবশ্য এলাকার ভূমিপুত্র আঞ্চলিক গবেষক শিবেন্দু মান্না মনে করেন মন্দিরটির নির্মাণকাল অন্ততপক্ষে ষোড়শ শতক। মুকুন্দের 'চণ্ডীমঙ্গলে' দেবীর উল্লেখ থাকায় সিংহবাহিনী দেবীর উপাসনা যে ষোড়শ শতকের বলে শিবেন্দু মান্না মনে করেন তা যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। কেতকাদাস 'মনসামঙ্গল'- এ 'দেবদেবী-বন্দনা' অংশে কবি লিখেছেন "অপরাধ করো ক্ষেমা ভবের ভবানী।/ বালিয়াতে বন্দিলাম সিংহবাহিনী।।"[২০] এ ছাড়াও কালিকামঙ্গল' কাব্যেও রি দেবীর উল্লেখ রয়েছে। হাওড়া জেলায় দেবী সিংহবাহিনী অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে পূজিত হতেন বলেই মধ্যযুগের বাঙালি কবিদের কাব্যে বারবার দেবী প্রসঙ্গ এসেছে। বর্তমানে এখানে যে দেবী মূর্তিটি রয়েছে তিনি অষ্টভূজা কাঞ্চনবর্ণা, উচ্চতা দেড় মিটার। তার ডান দিকের হাতগুলিতে রয়েছে অসি, বাণ ও পাশ এবং বাঁ দিকের হাতগুলিতে রয়েছে ঢাল, ধনুর্বাণ, শঙ্খ। অবশিষ্ট বাম ও ডান হাত দুটি বর ও অভয়মুদ্রা। দেবী শ্বেত সিংহ বাহনে উপবিষ্ট। মূর্তিটি নিমকাঠ দিয়ে নির্মিত। দেবী মূর্তি যেহেতু নিম কাঠের তৈরি তাই এই অঞ্চলে নিমকাঠ পোড়ানো হয় না। যাহোক অতীতকাল থেকেই জগৎবল্লভপুর তথা হাওড়া জেলার সিংহবাহিনী দেবী অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে পূজিত হয়ে আসছেন।

পরিশেষে বলা যায়, আলোচ্য কাব্যদুটির বন্দনা অংশে উল্লিখিত তীর্থক্ষেত্রগুলি কেবল ধর্মীয় ভক্তি ও দেবমাহাত্ম্যের প্রকাশ নয়। কাব্যগুলি হয়ে উঠেছে মধ্যযুগীয় বাংলার লোকবিশ্বাস, আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং সমাজজীবনেরও গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এই সকল তীর্থস্থানকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা কিংবদন্তী, লোকাচার, পূজা-পার্বণ এবং সামাজিক স্মৃতি আজও বাংলার লোকসংস্কৃতির ধারাকে বহন করে চলেছে। আলোচ্য তীর্থগুলির অধিকাংশই গ্রামবাংলার লৌকিক দেবদেবীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, যাঁরা কালক্রমে বৃহত্তর হিন্দু সমাজে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। মঙ্গলকাব্যের কবিগণ তাঁদের কাব্যে এই সকল তীর্থ ও দেবদেবীর উল্লেখের মাধ্যমে সমকালীন বাংলার ধর্মচেতনা ও লোকজ সংস্কৃতির এক জীবন্ত চিত্র অঙ্কন করেছেন। একই সঙ্গে এও স্পষ্ট হয় যে, তৎকালীন বাংলার বহু জনপদ, বন্দর, নদীতীর ও গ্রামীণ অঞ্চল ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে বিশেষ গুরুত্ব বহন করত। ফলে মঙ্গলকাব্যের তীর্থবর্ণনা কেবল সাহিত্যিক উপাদান নয়, বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস অনুধাবনেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

তথ্যসূত্র:

১) নস্কর, সনৎকুমার সম্পাদিত। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গ। প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০২১, পৃ.৬।

২) বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার ও চৌধুরী বিশ্বপতি সম্পাদিত। কবিকঙ্কণ-চন্ডী (প্রথমভাগ) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। জুন ১৯৫৮, পৃ. ২৪।

৩) সেন, প্রলয়, পশ্চিমবাংলার তীর্থ, খসড়া, ২০২৩, পৃ. ৬৮

৪) নস্কর, সনৎকুমার সম্পাদিত। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গ। প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০২১, পৃ.৬।

৫) শ্রী ভট্টাচার্য, আশুতোষ। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস। এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রা: লি:, কলকাতা, জুলাই ২০২২, পৃ. ৩৫৩।

৬) চৌধুরী, দুলাল। পল্লব সেনগুপ্ত সম্পাদিত। লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ। পুস্তক বিপণি, কলকাতা, এপৃল ২০২২, পৃ. ৪৯৪।

৭) বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার ও চৌধুরী, বিশ্বপতি সম্পাদিত। কবিকঙ্কণ-চন্ডী (প্রথমভাগ) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। জুন ১৯৫৮, পৃ.২৫।

৮) ঘোষ, বিনয়। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (২য় খন্ড)। দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০২০, পৃ. ১৫১

৯) নস্কর, সনৎকুমার সম্পাদিত। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গ। প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০২১, পৃ.৬।

১০) বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার ও চৌধুরী, বিশ্বপতি সম্পাদিত। কবিকঙ্কণ-চন্ডী (প্রথমভাগ) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। জুন ১৯৫৮, পৃ.২৪।

১১) বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমেন্দ্র। হাওড়া জেলার ইতিহাস। ভাস্বতী, কলকাতা, First edition 1st January 1999, পৃ.৭৫-৭৬।

১২) তদেব, পৃ. ২৬।

১৩) নস্কর, সনৎকুমার সম্পাদিত। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গ। প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০২১, পৃ.৬।

১৪) তদেব. পৃ. ৬ এবং ড. আচার্য্য দেবেশ কুমার সম্পাদিত কবিমুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল (১ম খন্ড)। ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১লা বৈশাখ ১৪০৬, অষ্টম পরিমার্জিত সংস্করণ জানুয়ারি ২০২১, পৃ. ১৮৯।

১৫) ঘোষ, বিনয়। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (২য় খন্ড)। দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০২০, পৃ. ১৫১।

১৬) ড. আচার্য্য দেবেশ কুমার সম্পাদিত কবিমুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল (১ম খন্ড)। ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১লা বৈশাখ ১৪০৬, অষ্টম পরিমার্জিত সংস্করণ জানুয়ারি ২০২১, পৃ. ১৮৮।

১৭) নস্কর, সনৎকুমার সম্পাদিত। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গ। প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০২১, পৃ.৬।

১৮) বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীকুমার ও চৌধুরী বিশ্বপতি সম্পাদিত। কবিকঙ্কণ-চন্ডী (প্রথমভাগ) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। জুন ১৯৫৮, পৃ.২৭।

১৯) তদেব।

২০) নস্কর, সনৎকুমার সম্পাদিত। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গ। প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০২১, পৃ.৬।